আপনার অভিমত

কাজই যেখানে অপ্রতুল, সংরক্ষণ কতটা কাজের?

ভারতীয় সংবিধানে সামাজিক বৈষম্যের নিরিখে সংরক্ষণের কথা বলা আছে। ভিত্তি হিসেবে আর্থিক অসাম্যকে মান্যতা দেওয়া হয়নি। লিখছেন

অরিন্দম চক্রবর্তী

ভারতে প্রথম বার সামাজিক বঞ্চনার পরিবর্তে আর্থিক বঞ্চনার নিরিখে সংরক্ষণ হচ্ছে। লোকসভায় ১২৪ তম সংবিধান সংশোধন এর মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা অসংরক্ষিত শ্রেণির মানুষদের জন্য ১০ শতাংশ চাকরি বা শিক্ষাক্ষেত্রে সংরক্ষণ বিল পাশ হল। লোকসভা ও রাজ্যসভা দুটোতেই সর্বসম্মতি পেল এ বিল। বিপক্ষে ভোট দিলেন মাত্র সাত জন। এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে মনে হয় না সে অনুমোদনে কোনও সমস্যা হবে। তবে সুপ্রিম কোর্টে ইতিমধ্যে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে বিলটির আইনগত ও সাংবিধানিক বৈধতা বিচারের জন্য। এখানেই উঠে আসছে একাধিক প্রশ্ন।

সত্যি কী বিলটির সাংবিধানিক বৈধতা আছে? যদি আমরা ইতিবাচক ভাবে দেখি তা হলে বলতে হয়, সংবিধানের ৪৬ অনুচ্ছেদের নির্দেশমূলক নীতিতে উল্লিখিত হয়েছে যে, আর্থিক দিক থেকে দুর্বল শ্রেণির আর্থিক ও শিক্ষাগত স্বার্থরক্ষার জন্য সরকার বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারে। ফলে, এই বিলের মধ্যে দিয়ে সরকার সেই কাজটাই করছে। কিন্তু যদি নেতির কথা বলা হয়, তবে আমরা দেখি যে সংবিধানের ১৫(৪) ও ১৬(৪) ধারায় পরিষ্কার বলা আছে যে, সংরক্ষণের সীমা কখনওই ৫০ শতাংশ ছাড়াবে না। ২০১০ সালের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশবলে কোনও রাজ্য চাইলে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার নিরিখে ৫০ শতাংশের বেশি সংরক্ষণ দিতে পারে। সেইমতো তামিলনাড়ুতে ৬৯ শতাংশ, তেলেঙ্গনায় ৬২ শতাংশ বা মহারাষ্ট্রে চাকরির ক্ষেত্রে পিছড়েবর্গের জন্য ৫২ শতাংশ সংরক্ষণ আছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্তরে সে সুযোগ এখনও পর্যন্ত নেই। ইতিমধ্যে অন্যান্যদের জন্য যে ৪৯.৫ শতাংশ সংরক্ষণ আছে সেটি ধরলে মোট সংরক্ষণ দাঁড়াবে ৫৯.৫ শতাংশ। ফলে, সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

তা ছাড়া, ভারতীয় সংবিধানে সামাজিক বৈষম্যের নিরিখে সংরক্ষণের কথা বলা আছে। সংরক্ষণের ভিত্তি হিসেবে আর্থিক অসাম্যকে মান্যতা দেওয়া হয়নি। তবে আর্থিক মানদণ্ডটি ব্যবহার হয় সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের মধ্যে প্রান্তিক জনকে সুবিধা দিতে। সে জন্যই ওবিসিদের মধ্যে যারা 'ক্রিমি লেয়ার' মানে, 'আর্থিক ভাবে এগিয়ে' নেই তাদেরকেই সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু এই বিলে কেবল মাত্র আর্থিক বঞ্চনার নিরিখে সংরক্ষণের কথা ভাবা হয়েছে। ইতিপূর্বে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ মেনে ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণ নিয়ে ক্ষোভ প্রশমিত করতে ১৯৯২ সালে নরসিংহ রাও যখন আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা উচ্চবর্ণের জন্য সংরক্ষণ করতে গিয়েছিলেন ইন্দ্রা

সাহনীর মামলার নিরিখে সুপ্রিম কোর্ট সংরক্ষণের উর্ধসীমা ৫০ শতাংশে বেঁধে দিয়েছিল। মনমোহন সরকারের জমানায়ও আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের সুপারিশ করা হয়েছিল। বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের ইন্দ্রা সাহনী মামলার রায়। ফলে এবার এই বিল নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট কী রায় দেয়, সেটাই এখন দেখার।

সংরক্ষণ বিলে আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়ার জন্য যে মানদণ্ডগুলি নেওয়া হয়েছে, তা একাধিক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। প্রথমত, বার্ষিক আয় হতে হবে আট লক্ষ টাকা বা মাসে ৬৬৫০০ টাকা মতো। অর্থাৎ, মাসে ৩০০০০ টাকা মাইনে পেলে আমায় ট্যাক্স দিতে হবে। কিন্তু ৬৬৫০০ টাকা আয় পর্যন্ত আমি আর্থিক ভাবে বঞ্চিতের দলে। হাস্যকর মনে হলেও অনেক মানুষের কাছে এ উর্ধসীমা আনন্দের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে। তা ছাড়া, জমির পরিমাণ হতে হবে পাঁচ একরের কম। বাড়ি ১০০০ বর্গফুটের মধ্যে। বড় মেট্রোপলিটন শহরে যার দাম এক কোটি টাকাও হতে পারে। পুরসভা এলাকায় ১০০ গজের কম বসত জমি আর পুর এলাকার বাইরে ২০০ গজের কম বসত জমি। এত কিছু থাকার পর যদি কেউ আর্থিক ভাবে বঞ্চিত হন, তবে অর্থনীতির পাঠে বঞ্চনা বা দারিদ্রকে নতুন ভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে।

বিল পাশ হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সামাজিক ন্যায়ের ক্ষেত্রে এটি একটি বিরাট জয়। একথা শুনতে ভাল লাগলেও বাস্তব বলে, রাজনীতির কান্ডারিরা বরাবরই সংরক্ষণকে ভোটের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সেখানে একেবারেই গৌণ। সে ৯০-এর দশকে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশই হোক বা আজকের এই বিল। উচ্চবর্ণের মধ্যে যারা আর্থিক ভাবে পিছিয়ে তাদের জন্য সংরক্ষণের দাবিতে গুজরাত, রাজস্থান, মহারাষ্ট্রে পাতিদার, জাঠ, গুজ্জর, মরাঠারা আন্দোলন করেছেন। এই বিল সে চাঁদমারিতে আঘাত করেছে। এ বার সংরক্ষণের আওতায় আসবে ব্রাহ্মণ, বানিয়া, প্যাটেল, মরাঠা, গুজ্জর, ঠাকুর এবং মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের কিছু অংশ। ভোটবাক্সে প্রভাব পড়বে বইকি!

বিলটি শেষ পর্যন্ত যদি বাস্তবায়িতও হয়, তবেও কতটা কাজে আসবে সেটা একটা প্রশ্ন। 'কাউন্সিল অফ মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি'র তথ্য জানাচ্ছে যে, ডিসেম্বর ২০১৮ এ দেশে কর্মহীনতার হার ৭.৪ শতাংশ, যা গত ১৫ মাসে সর্বাধিক এবং ২০১৮ সালে ভারতে এগারো মিলিয়ন বা এক কোটি দশ লক্ষ কাজ বিনষ্ট হয়েছে। তা ছাড়া, ভারত সরকারের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯৪ সালে সরকারি কর্মী ছিল ৪১৭৬০০০। যা ২০১৪ সালে কমে হয়েছে ৩৩০২০০০ জন। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ১০ শতাংশ হারে কর্মী কমিয়ে আনা সরকারের উদ্দেশ্য বলে সপ্তম বেতন কমিশনকে জানিয়েছিল কেন্দ্র। ফলে, দিনে দিনে কমে আসছে সরকারি চাকরির ক্ষেত্র। অনেক সরকারি অফিস চলছে চুক্তিভিত্তিক কর্মীর দ্বারা সেখানে সংরক্ষণ কার্যকারী নয়। যেখানে কাজই অপ্রতুল, সেখানে সংরক্ষণ কতটা কাজে আসবে? না কি কেবল প্রতিশ্রুতি হয়ে নির্বাচনের বৈতরণি পার হতে সাহায্য করবে এই উচ্চবর্ণের সংরক্ষণ? সেটাই দেখার।

পরিশেষে, এই সংরক্ষণ বিল প্যান্ডোরার বাক্স খুলে দিতে পারে। এত দিন ৫০ শতাংশ একটা লক্ষণরেখা ছিল। সেই রেখা অতিক্রান্ত। এ বার বাকি জনজাতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের উর্ধ্বসীমা বাড়ানোর একটা চাপ তৈরি হবে। সংরক্ষণের সীমা ৫০ শতাংশ অতিক্রমের নিরিখে ইতিমধ্যেই সমাজবাদী পার্টির নেতা রামগোপাল যাদব যেমন ওবিসির জন্য সংরক্ষণ আরও চার শতাংশ বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন।

এ তো সবে শুরু! ফলে, আগামী দিনে সংরক্ষণ কত শতাংশে গিয়ে দাঁড়াবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

মাজদিয়া সুধীরঞ্জন লাহিড়ি মহাবিদ্যালয়ের অর্থনীতির শিক্ষক

ABP - 01/02/19

Scanned by CamScanner